মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
১৬/৪/১, রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন, হাওড়া - ১

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতক বাংলার এক সুবর্ণ যুগ। এই কালখণ্ডে বেশ কিছু সংখ্যক বড় মাপের মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের নিরলস প্রয়াসে, ব্যক্তিত্বে, সততায় ও নিষ্ঠায় 'বাবু কালচারে' নিমগ্ন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তা পরিণতি পায়; জাতীয় জীবনকে প্লাবিত করে এবং ভারত স্বাধীন হয় — সে স্বাধীনতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক, যদিও অনেক বিচারে তা অসম্পূর্ণ। এই রকম একজন খুব বড় মাপের মানুষ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার।

আজ বিস্মৃত-প্রায় এই মহান ব্যক্তিত্বের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা, অসাধারণ যোগ্যতা, সত্যনিষ্ঠা, সারল্য, নিরভিমান সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, স্বাভিমান, ভগবৎ ভক্তি, পবিত্রতা, আত্মসুখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রভৃতি দুর্লভ গুণের সমাবেশ তাঁকে দুর্জয় ক'রে তুলেছিল। তাই সামাজিক দোষ ত্রুটির সংস্কারে, শিক্ষা প্রসারে, জনসেবায়, জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে এবং জাতীয় চারিত্র্য নির্মাণের এক দক্ষ কারিগর রূপে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে।

আমাদের বিশ্বাস এই চারিত্রিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আস্থাহীনতার যুগে এরূপ মহাপুরুষদের জানলে চিনলে আমাদের বোধোদয় হ'তেও পারে। একজন মানুষ কত বড়, কত মহান এবং কতটা যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে পারেন, তার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এই মহাত্মা। অতি সংক্ষেপে স্বল্প পরিসরে এই জীবনের পরিচয় আজকের বালকদের সামনে তুলে ধরার বাসনায় এই পুস্তিকার পরিকল্পনা। তাঁর জীবনের ঘটনা সমূহ ও সাফল্য আপাত অসম্ভব মনে হ'লেও এই পুস্তিকায় বর্ণিত প্রতিটি

বিষয় তথ্যভিত্তিক। এরূপ পূর্বসুরীদের কথা ভুলে যাওয়া এক জাতীয় অপরাধ। সেই অপরাধ হ'তে যাতে আগামী প্রজন্ম মুক্ত হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই শিশু মন্দির বা শিশু তীর্থের ভাই বোনেদের হাতে এই ছোট্ট পুস্তিকাটি আমরা তুলে দিচ্ছি।

এক দৈবী ব্যক্তিত্ব

"যদি নাম করতে চাও তবে কলকাতা যাও — কাজ করতে চাইলে বরিশালেই থাক" — একথা অশ্বিনীকুমারকে বলেছিলেন প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ঋষি অরবিন্দের মাতামহ শ্রীরাজনারায়ণ বসু। অশ্বিনীকুমার তাঁর আদেশ নতমস্তকে মেনে নিয়ে বরিশাল জেলাকেই তাঁর কর্মভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ঋষি রাজনারায়ণের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয়নি। অশ্বিনীকুমার বরিশালেই কাজ করেছিলেন — জেলার আপামর সাধারণের হৃদয় সম্রাট হ'য়েছিলেন, বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছায় সারা জেলার জনমানস আন্দোলিত হ'ত — এটা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু তাঁর নাম হয়নি একথা ঠিক নয় — বরিশালের গণ্ডী পেরিয়ে সারা ভারতে এমন কি বিলাতেও তাঁর সুনাম পৌঁছেছিল। সারা ভারতের কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি এক বিখ্যাত চরিত্র হ'য়ে উঠেছিলেন — সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় পথে বার হলেই জনতা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিত — 'অশ্বিনীকুমার দত্ কী জয়'। তিলক অনুগামী চরমপন্থী দলের অধিকাংশই তাঁকে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিজ কর্মক্ষেত্র বরিশালেই ফিরে আসেন।

বড় মানুষ বলতে জেলার বাচ্চারাও তাঁকেই জানত আর বাবু (নেতা) বলতে সকলে বুঝত অশ্বিনীকুমারকেই। ম্যাজিস্ট্রেট ফুলার, ঢাকার নবাব — কারও কথাতেই বরিশালবাসী কান দিত না — বাবু যতক্ষণ না বলছেন, কেউ কিছু করতে নারাজ — তাঁর আদেশে সকলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরী। ঢাকার নবাবের নির্দেশের চেয়েও বাবুর ইচ্ছা অনিচ্ছাই দরিদ্র মুসলমানদের কাছেও বড় ছিল। তিনি যে সকলের আপনজন!

সকলের আপদে বিপদে রোগে শোকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের মতো অবতীর্ণ হতেন যে এই মহাত্মা! মাতাল কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ গোপালকে গুণমুগ্ধ অশ্বিনীকুমার বুকে জড়িয়ে ধরেছেন — তার দোষটাকে বড় না করে গুণটাকেই দেখেছেন। তাঁর বৈঠকখানার ফরাসে — যেটা তাঁর রাত্রের শয্যাও — দিনরাত ছাত্র, বন্ধু, অভ্যাগতদের ভীড় লেগেই থাকত। এটা সকলেরই বসার, আলোচনা করার জায়গা ছিল। ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, উঁচুজাত-নীচুজাতের কোন বাছবিচার ছিলনা — সকলের জন্যই তা অবারিত ছিল। সব মানুষকেই তিনি আপন — একান্ত আপন মনে করতেন — তাই সকলেই তাঁকে আপন ব'লে জানতো। তাই শত অত্যাচারেও ঢাকার নবাব বা ম্যাজিস্ট্রেট ফুলার গুর্খা সৈন্য লেলিয়ে দিয়েও "পূণ্যে বিশাল" বরিশালকে নত ক'রতে পারেনি — স্বদেশী আন্দোলনের দুর্জয় ঘাঁটি বরিশালে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি। তাই তো স্যার আশুতোষ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন, গান্ধীজী অসুস্থ অশ্বিনীকুমারকে দেখতে তাঁর বাড়ী যান, তাই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষার হলে অপরের খাতা দেখে লেখার কথা ভাবতেই পারত না। স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বেলুড় মঠ ও মিশন স্থাপন করার সময় তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছেন, অসুস্থ দেশবন্ধু নিজের মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পূর্বে নগ্নপদে হাজার হাজার গুণগ্রাহীর একজন হয়ে অশ্বিনীকুমারের দাহ সংস্কারের সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর ছোটলাট হিউয়েট জেলে তাঁর স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে গিয়েছেন আর বাংলার ছোটলাট বেলি বৃষ্টির সময় তাঁর মাথায় ছাতা ধ'রেছেন। জেলের কয়েদীরা তাঁকে পরম যত্নে সেবা ক'রে পরিতৃপ্ত হ'ত। আর এগুলো নিয়ে পরিহাস করতেন অশ্বিনীকুমার। এই রকম এক দৈবী ব্যক্তিত্ব যা ছোট বড় সকলকেই সমভাবে প্রভাবিত করেছিল — বহু ভাষাবিদ্, জীবন্ত বিশ্বকোষ, বিবাহিত হ'য়েও আজীবন ব্রহ্মচারী — অথচ স্ত্রীকে সঙ্গে রেখে স্ত্রীশিক্ষার কাজে যোগ্য ক'রে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলার মতো অসাধারণ কাজ তাঁর কাছে স্বাভাবিক ছিল। স্বল্প কথায় এই অশ্বিনীকুমারের পরিচয়।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

১৮৫৬ সালে ২৫ জানুয়ারী বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে তাঁর জন্ম। পিতা ব্রজমোহন দত্ত, মাতা প্রসন্নময়ী। পিতা সদরালা (সাব জজ), তাই বদলীর চাকুরী। স্বভাবতঃই বিভিন্ন স্থানে তাঁর পড়াশোনা। বিদ্যালয়ে পড়েছেন রঙপুরে, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। আর বি.এ. পাশ করেন কৃষ্ণনগর থেকে। হরিনাম সংকীর্ত্তন শৈশব থেকেই তাঁকে খুব আকর্ষণ ক'রত। কাগজের ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে হরিতলায় নাম সংকীর্তন করা তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। ধর্ম জীবন খুব ছোটবেলা থেকেই শুরু হয় — প্রার্থনা তিনি নিত্য করতেন — বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ধর্ম চর্চা করা বাল্যের অভ্যাস। প্রেম এবং ভক্তি তাঁর ধর্ম জীবনের মূল ছিল। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে এন্ট্রান্স পাশ করার পর তিনি যখন জানলেন পরীক্ষায় বসার জন্য তাঁর বয়স ভাঁড়ানো হয়েছে কারণ ষোল বৎসরের নীচে পরীক্ষা দেওয়া আইনতঃ চলে না, সেই বয়সেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বেচ্ছায় পরবর্তী পর্যায়ে দুই বৎসর সময় তিনি পরীক্ষা দিতে দেরী করেন। সত্যপথে অটল থাকার দৃঢ় মানসিকতার এটা জ্বলন্ত নিদর্শন।

বি.এ. পাশ করার পর তিনি কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৯ সালে এম.এ. পাশ করে একটা বিদ্যালয়ের সাত মাস প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। এর পর ১৮৮০ সালে বি.এল. পাশ করে বরিশালে ওকালতি করার জন্য ফিরে যান।

অর্থোপার্জন — সামাজিক সংস্কার

খ্যাতনামা কৃতি পিতার চরিত্রবান, পণ্ডিত, সুবক্তা বিশেষতঃ ইংরাজী বক্তৃতায় বিশেষ পারদর্শী, ন্যায় নিষ্ঠ এই সুদর্শন তরুণ উকিলের পসার জমতে দেরী হ'ল না। কিন্তু কেবল অর্থোপার্জনই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাই তৎকালীন ভদ্র সমাজের চারিত্রিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। সুরাসুন্দরীর সেবা ও তদনুষাঙ্গিক ব্যসনে মত্ত সমাজ বিশেষতঃ ব্যবহারজীবী সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও ব্যসন নিরোধকল্পে ১৮৮৫ সালে তিনি সেখানে "পিপলস্ এসোসিয়েশন" নামক এক সমিতি প্রতিষ্ঠা

ক'রলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিরলস প্রয়াস বহুলাংশে ফলপ্রসূ হয়। এর আগের বৎসর পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি বরিশালে ব্রজমোহন ইন্সটিটিউট স্থাপন করেন। লেখাপড়া কেবল নয়, তার সঙ্গে চরিত্র নির্মাণও এই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন-পরীক্ষা ব্যবস্থা ঠিক মত হ'ত কিন্তু চরিত্র ও নীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল না। ফলে এই শিক্ষা মনুষ্য নির্মাণে ব্যর্থ হচ্ছে, এটা উপলব্ধ ক'রে, এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন বিদ্যলয়ের পরিকল্পনা করলেন তিনি। এরও তিন বৎসর আগে ১৮৮১ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ৪/৫ দিন অবস্থান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী — প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁকে আরও মহত্তর জীবন-রচনার জন্য প্রেরণা যোগায়। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ১৮৮২ সালে এই তরুণ ব্যবহারজীবী বেশ কিছুদিন যশোরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসেবে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যেও কাজ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন। উকিল হিসেবে তাঁর পসার ও উপার্জন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে — রোজগার বার্ষিক ৫০০০ টাকা ছাপিয়ে গেছে এমন সময় হঠাৎই একদিন তিনি ওকালতি ছেড়ে দিলেন। এক মক্কেলের স্বার্থে এক মামলায় তাঁকে অর্ধসত্য কথা বলতে হয় — যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তাঁর মতো সত্যসন্ধ মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। সেটা ১৮৮৯ সাল। সত্যের আহ্বানে উপার্জনশীল ব্যবহারজীবী আইন ব্যবসা ছেড়ে অবৈতনিক অধ্যাপক হিসেবে ব্রজমোহন কলেজে যোগ দিলেন — যেটা সেই বছরেই শুরু হয়েছে। বস্তুতঃ ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশনের সুদিন এই সময় থেকেই শুরু হ'ল।

শিক্ষক অশ্বিনীকুমার — ব্রজমোহন বিদ্যালয়

শিক্ষক হিসেবে অশ্বিনীকুমারের সাফল্য অনন্যসাধারণ। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও পালী ভাষা তিনি ভালভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। মারাঠী ভাষায় লিখিত রামদাস স্বামীর দাসবোধ তিনি

ঐ ভাষাতেই প'ড়েছেন। গুরুমুখী ভাষায় গ্রন্থসাহেব, তুলসী দাসের রামচরিত মানস, তুকারামের ভক্তিরসাশ্রিত রচনা তিনি মূল গ্রন্থ থেকে পাঠ করতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল — ফরাসী ভাষাও তাঁর জানা ছিল। শুধু পাণ্ডিত্যই নয়, আচার্য হ'তে গেলে চাই আদর্শ আচরণ — যেটা তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সেজন্য নিজের দৃষ্টান্তে তিনি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর সমস্ত শিক্ষাই ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ক'রত — কারণ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের শিক্ষকের আদর্শ জীবন তাঁর সমস্ত ছাত্রের প্রেরণার উৎস ছিল। তিনি সাদাসিধা পোশাক পরিধান করতেন। কেউ পরিচ্ছদে বাহুল্য করলে তাকে তিরস্কার করতে দ্বিধা করতেন না। ছাত্রদের সঙ্গে সমবয়স্কের মতো মেলামেশা করতেন তিনি। ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনায় কোন বাধা রাখতেন না। তাঁর কাছে আসার জন্যও কারও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তাঁর বৈঠকখানাতেই সর্বদা তিনি বসে থাকতেন দরজা সব সময় খোলা থাকত। এখানেই রাজনীতির (স্বদেশীর) চর্চা চ'লত এবং অন্তরঙ্গ ছাত্রদের নিয়ে আড্ডাও চ'লত। কখনো বা তিনি ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে বার হতেন। পথে সব রকম খোলামেলা আলোচনা চ'লত। ছাত্ররাও অকপটে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় কিছুই গোপন ক'রত না। প্রয়োজনে দুঃস্থ ছাত্রদের তিনি অর্থ সাহায্যও করতেন। বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমার ছিলেন এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে সব জ্ঞাতব্য জানতে পারত — সব রকম ভাবে উপকৃত হ'ত। আদর্শ চরিত্র এই মাস্টারমশাই তাদের জীবনে ধ্রুবতারা-স্বরূপ ছিলেন।

বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক হিসেবে তিনি বেশ কয়েকজন উপযুক্ত সহকর্মীও পেয়েছিলেন। তাঁরা নামমাত্র বেতনে কাজ করতেন প্রাণমন দিয়ে। অশ্বিনীকুমার কলেজ থেকে বেতন তো নিতেনই না পরন্তু প্রয়োজনে সাধ্যমতো অর্থ-সাহায্য দিতেন।

কলেজের লাইব্রেরীতে তিনি দেশ বিদেশের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে রাখেন এবং সেগুলির অবলম্বনে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সহজ সরল ভাবে পুস্তক সংকলন করান। অনুবাদের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্থানীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষায় বইগুলি প্রাসঙ্গিক ভাবে রচিত হ'লে ছাত্রদের পক্ষে অধিক ফলদায়ী হবে ব'লে তিনি মনে করতেন। তাঁর নির্দেশে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লেখেন একজন কৃতবিদ্য উকিল, আর একজন অর্ধশিক্ষিত যুবককে দিয়ে তিনি লেখান ইটালির স্বাধীনতার ইতিহাস। দেশ বিদেশের এই সব বই-এর সঙ্গে মারাঠা ও রাজপুতদের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাসও এই সংকলনগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরকম ১৯টি বিশেষ পুস্তক তিনি ছাত্রদের পড়ানোর জন্য সঙ্কলন করিয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের খ্যাতি সারা বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হ'ল। দিবারাত্র ছাত্রদের ভালমন্দ দেখা — তাদের সহায়তা করা — ছাত্রাবাসের ছাত্ররা তো সর্বতোভাবে উপকৃত হ'তই — এছাড়াও রাত্রে দেখা যেত হারিকেন হাতে অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী ঘুরছেন তাদের তত্ত্বতল্লাশ নিচ্ছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষার হলে পাহারার ব্যবস্থা থাকত না। এই বিশ্বাসের অমর্যাদা কোন ছাত্র কখনো করেছে এ রকম কথা কখনো কেউ শোনেনি। ফলতঃ কি পরীক্ষার ফল, কি আচরণ, কি চরিত্র, কি কর্মক্ষমতা, কি অধ্যবসায় — সব দিক দিয়েই ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা এক নম্বরে। বিদ্যালয়ের সাফল্য দেখে বাংলা সরকার উপযাজক হ'য়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য দিতে চাইল। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সঙ্গত কারণেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য তো কেবল মাত্র একটা স্কুল বা কলেজের সংখ্যা বাড়ানো নয়, জাতীয় চরিত্র নির্মাণ — মনুষ্য নির্মাণই যে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য। সে সময় বহু পদস্থ ইংরাজও ব্রজমোহনের ভক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের সরকারী অফিসে বা ব্যক্তিগত কাজে ব্রজমোহনের প্রাক্তন ছাত্রদের বেছে বেছে নিয়োগ করতেন তাঁরা। অসংখ্য ছাত্র অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় লাহোর হ'তে গৌহাটী পর্যন্ত সমস্ত কলেজেই ব্রজমোহনের প্রাক্তন ছাত্ররা অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাংলার এমন কোন বিদ্যালয় ছিলনা যেখানে ব্রজমোহনের প্রাক্তন ছাত্ররা শিক্ষকতা করেন নি। প্রতি বৎসর ব্রজমোহনের ছাত্ররা সরকারী বৃত্তি পেত।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন দেশে আরম্ভ হতে বরিশাল জেলায় তার প্রভাব দেখে সরকারের টনক নড়ল। তারা বুঝল আসলে ব্রজমোহন একটা স্কুল বা কলেজ নয় — বাস্তবে এটা প্রশ্নাতীত যোগ্যতা সম্পন্ন দেশপ্রেমিকের সূতিকাগার। অন্যকথায় ব'ললে এটা ভারতে ইংরাজ সরকারের কবরখনক। আর এর সমস্ত সাফল্যের মূলে রয়েছে একটি মানুষের প্রবল উপস্থিতি। সরকারের চিন্তা নোতুন খাতে বইতে শুরু করল। প্রথমে ব্রজমোহনের ছাত্রদের সরকারী চাকুরী প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হ'ল। এমনকি বৃত্তি প্রাপ্তদের কেউ ব্রজমোহনের ছাত্র হ'লে তাকে সরকারী বৃত্তি হ'তে বঞ্চিত করা হ'ল। তবু কিন্তু কেউ ব্রজমোহন ছাড়ল না। দেবপ্রসাদ ঘোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হ'ল। তাকে সরকারী বৃত্তি দেওয়া হ'ল না। সে কিন্তু ব্রজমোহন কলেজেই ভর্তি হ'ল। এরকম আরও অনেক ভাল ভাল ছাত্র এসে ব্রজমোহনের গৌরব বৃদ্ধি করতে শুরু করল। ব্রজমোহনের রেজাল্ট আরও ভাল হ'তে থাকল। পড়াশোনার সাথে সাথে স্বদেশী আন্দোলনের সূতিকাগার, কর্মী নির্মাণের কারখানা হিসেবে ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুল অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে থাকল।

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে বরিশালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা অশ্বিনীকুমার। তাই সারা ভারতের দৃষ্টি এবার বরিশাল তথা অশ্বিনীকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। এই আন্দোলন বরিশাল জেলার মতো এতো ব্যাপক, এত নিশ্ছিদ্র, ভারতের আর কোন অঞ্চলে ক'রে ওঠা সম্ভব হয়নি। এর একমাত্র কারণ অশ্বিনীকুমারের জনপ্রিয়তা, তাঁর প্রতি জেলাবাসীর অটুট আস্থা — যেটা তাঁর চরিত্রগুণেই সম্ভব হয়েছিল। এই বয়কট আন্দোলনে বরিশালে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী এক বৎসরে তিন কোটি টাকা কমে গেল। জেলার ৫২টি বিলাতি মদের দোকানের ৫১টিই ক্রেতার অভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হ'য়ে গেল। অনেকেই সুরাসক্তি চিরতরে বিসর্জন দিল। ম্যাজিস্ট্রেট ফুলার নিরীহ নগর ও গ্রামবাসীদের ওপর গোর্খা সৈন্য লেলিয়ে দিল। অশ্বিনীকুমারও লাঞ্ছিত

হ'লেন। কিন্তু শত অত্যাচারেও ববিশালবাসীকে নত করা গেল না। ম্যাজিস্ট্রেটের পর ম্যাজিস্ট্রেট বদলী হ'ল, কংগ্রেস কনফারেন্স লণ্ডভণ্ড হ'ল, কিন্তু বরিশাল টলল না। কি জানি কি জাদুদণ্ড ছিল অশ্বিনীকুমারের কাছে! এতখানি সর্বাত্মক সফল নেতৃত্ব কদাচিৎ মেলে। নোতুন ম্যাজিস্ট্রেট বুলার ঢাকার নবাবের সাহায্যে মুসলিম এলাকায় নোতুন বাজার বসিয়ে বিলাতি পণ্যের প্রচলন করতে চাইল। কিন্তু বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা কেউ এলো না। মুসলমানদের আলাদা ভাবে নবাবের আদেশের কথা শোনানো হ'ল — কিন্তু তারা বাবুর নির্দেশের এক পা বাইরে যেতে রাজি নয় — নবাব তো আজ ফরমান দিচ্ছে — কিন্তু বাবু যে চিরদিনের আপনজন।

কিভাবে এতটা সম্ভব হ'ল। একজনমাত্র মানুষের প্রতিরোধেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ রাজ অসহায়! এর মূলে রয়েছে অশ্বিনীকুমারের অন্তরের অকৃত্রিম ভালবাসা, অপূর্ব চারিত্র্যবল ও নিষ্ঠা। সকলের জন্য তাঁর দ্বার যে অবারিত — সকলের আপদে বিপদে যে তিনি সর্বদা পাশে আছেন, তার কথায় ও কাজে যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। হিন্দু মুসলমান, ধনী নির্ধন — উঁচুজাত নীচুজাত সকলেই যে প্রকৃতপক্ষেই তাঁর কাছে সমান তার অজস্র প্রমাণ যে বরিশালবাসীর নখদর্পণে। তাঁর আশ্বাস তো ফাঁকা আওয়াজ নয়, জেলার সব গ্রাম যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি চিনতেন। দুর্ভিক্ষে, রোগে, মহামারীতে প্রাণপণ সেবা, কলেরা রোগীর মলমূত্র স্বহস্তে সাফ করা — এসব তো সকলে স্বচক্ষে দেখেছে! তাইতো তাঁর কথায় এত শক্তি — তাইতো তাঁর ওপর আপামর সাধারণের এত বিশ্বাস।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ নেতৃত্ব গুণের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তিনি। চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। এরকম আরো অনেক গ্রামীণ মানুষকে তিনি গ্রাম্য ভাষায় গান লিখে তা গ্রামে গ্রামে গেয়ে সাধারণ লোকের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আবেগ সৃষ্টি করে স্বদেশী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন — যা বহুলাংশে সফল হয়েছিল।

স্বভাবতঃই ব্রজমোহনের প্রায় সব ছাত্র শিক্ষকেরা দেশপ্রেমের এক এক বহ্নিমান শিখা রূপে জ্বলতে শুরু ক'রল। বাজারে বাজারে পিকেটিং করা

হাজার গ্রামে "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" গঠনের মাধ্যমে স্বদেশী প্রচার, সেবা কাজ চালানো — এক কথায় কর্মযোগের সূচনা হল।

বরিশাল 'বাংলার বোষ্টন' অভিধা পেল। সারা বরিশালের জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছা আন্দোলিত হত একটি মানুষের কথায়। তার জন্য উপযুক্ত সংগঠন, কর্মী দল, নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা সবই সম্ভব হয়েছিল একজন ব্যক্তির অভিনব ব্যক্তিত্বে।

জনসেবা

মানবসেবায় অশ্বিনীকুমার অক্লান্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সব কর্মপ্রেরণার মূলে ছিল ভগবৎ প্রেম তথা মানব প্রেম। তরুণ ও যুবকদের তিনি পরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগাতেন। বরিশালে জনসেবার উদ্দেশ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ তিনি স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে স্বভাবতঃই স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বাখরগঞ্জে তিনি "হিতৈষিনী সভা" স্থাপন করেন এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রারম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা ঠিক ভাবে যাতে পরিচালিত হ'তে পারে তার জন্য নিজের স্ত্রীকে তিনি সেই ভাবে তৈরী ক'রে নেন।

যে কোন সময় দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে আর্তের পাশে দাঁড়াতেন। ১৯০৬ সালের বরিশালের দুর্ভিক্ষে অন্ন-বস্ত্র অর্থ সংগ্রহ, সংগঠনের মাধ্যমে উপযুক্ত স্থানে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া ও তার সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা — সমস্তই তাঁর নিরলস পরিশ্রমে ও দক্ষতায় যে ভাবে পরিচালিত হয়েছিল, তা দেখে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। ১৯১৯ সালের ঝড়ে বিধ্বস্ত বরিশালে আর্ত মানুষের ত্রাণকার্যে অশ্বিনীকুমার অসুস্থ শরীরেও সক্রিয় ভাবে নেতৃত্ব দেন।

সাধারণ ভাবেও জেলায় কেউ কোথাও অসুস্থ হ'লে তার চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা সবই "স্বদেশ বান্ধব সমিতি"-র মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রয়াস হ'ত। নিজে ব্যক্তিগতভাবে আর্তের বা রোগীর সেবায় সব সময়েই তিনি এগিয়ে আসতেন। আসলে আর্তের সেবাই তাঁর কাছে ঈশ্বর সেবার নামান্তর ছিল।

কংগ্রেস নেতা অশ্বিনীকুমার

যদিও তিনি মনে প্রাণে একজন শিক্ষক তথাপি একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে দেশের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। আর সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা সংগঠন কংগ্রেসের তিনি একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ভারতে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের জন্য বরিশাল থেকে চল্লিশ হাজার স্বাক্ষর যুক্ত দাবীপত্র তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেবার।

১৮৮৮ সালে তিনি বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন এবং ১৮৯৭ সালে ঐ সমিতির চেয়ারম্যান হন। ঐ বৎসরই তিনি বেরার কংগ্রেসে যোগ দেন। সেখানকার হালচাল দেখে কংগ্রেসের অধিবেশনকে তিনি 'তিন দিনের তামাসা' ব'লে অভিহিত করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন তাঁকে ভারত বিখ্যাত করে — একথা আগেই বলা হয়েছে।

১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জাতীয় সমিতির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। ঐ বৎসরই দাদাভাই নৌরজির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অশ্বিনীকুমার বালগঙ্গাধর তিলকের চরমপন্থী দলের সমর্থক ছিলেন।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হয়। নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। এর পর হ'তে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আর কোনও কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন নি তিনি।

শেষ পর্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশীধামে অবস্থানকালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে যোগ দান করেন, ১৯১৫ সালে। ১৯১৮ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে এবং ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯২১ সালে শেষবারের মতো বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বৃটিশ রাজের প্রতিহিংসা

ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশন আসলে একটা বিদ্যালয় নয়, এটা একটা অগ্নিগিরি, যেখান থেকে শত শত দেশকর্মী বার হয়ে এদেশে ইংরাজ রাজত্বের কবর খোঁড়ার কাজ ক'রে চলেছে নিরলসভাবে। তার জন্য ঐ কলেজকে ডিস্‌-অ্যাসোসিয়েট করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষকে। কিন্তু তেজস্বী আশুতোষ কারও কথায় কিছু করবেন না বেআইনীভাবে। সেজন্য তদন্ত করার জন্য উপযুক্ত বাঙালী অধ্যাপককে পাঠালেন। তিনি কিন্তু ব্রজমোহনের স্বপক্ষেই রিপোর্ট দিলেন। একজন ইংরাজ অধ্যাপক ক্যানিংহাম তদন্ত করতে এলেন এবার। তিনি বিলাতে থাকতেই অশ্বিনীকুমারের নাম শুনেছেন। সাক্ষাতে সব দেখেশুনে তিনি একেবারে মুগ্ধ! তিনি রিপোর্টে ব্রজমোহনের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে লিখলেন — "ব্রজমোহনের মতো এত ভাল কলেজ এদেশে থাকতে কেন যে ছাত্ররা অক্সফোর্ডে প'ড়তে যায়, আমি বুঝি না।" ফলে ক্যানিংহাম সাহেব সরকারের কুনজরে পড়ল। তার শাস্তি হল। কিন্তু ব্রজমোহনকে বন্ধ করতে না পেরে সরকার অন্য রাস্তা নিল। কলেজের প্রাণ-পুরুষকে সরিয়ে দাও। তার পর বাকী ব্যবস্থা করতে দেরী হবে না। অশ্বিনীকুমারকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রে লক্ষ্ণৌ জেলে নির্বাসনে পাঠানো হ'ল। তাঁর মতো মহান একজন মানুষের প্রতি এরকম ব্যবহারে ইংরাজের সুনাম নষ্ট হবে — মানুষ ক্ষুব্ধ হবে, এরকম অনেকেই বললেন। পার্লামেণ্টে পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনা হ'ল। কিন্তু সরকার অনড় থাকল — কারণ তো জলের মতো স্বচ্ছ। ১৯০৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর হ'তে ১৯১০ সালে ৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ জেলে বন্দী ছিলেন। এই কালখণ্ডের মধ্যে সরকার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি শুঁষে নেওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করল। ভারত সরকারও একাজে সহায়ক হওয়ায়

অশ্বিনীকুমার ফিরে এলেও আর ব্রজমোহনে সেদিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ল না। অসুস্থ অশক্ত শরীরে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। ভারতের দুভার্গ্য, বাংলার দুর্ভাগ্য, শিক্ষাজগতের এক অনুপম নিদর্শন ব্রজমোহন বিদ্যালয় নামক এক সর্বাংশে সফল প্রয়াসের মূলোচ্ছেদ ক'রল ইংরাজ সরকার নিজের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য ইংরাজ সরকার ভারতে বহুবার বহুস্থানে এরকম ভূরি-ভূরি দুষ্কর্ম ক'রেছে।

অন্তিম দিনগুলি

লক্ষ্ণৌ জেল হ'তে ফেরার পর তাঁর শরীর খুব ভাল যাচ্ছিল না। ১৯১২ সালে স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি ধানবাদ, কাশী, চিত্রকূট ইত্যাদি স্থানে বেশ কিছুকাল কাটান।

পর বৎসর কিছুদিন বরিশালে থেকে আবার বায়ু পরিবর্তনের জন্য জব্বলপুর যান। এভাবে মাঝে মাঝে বরিশালে এলেও স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলতঃ পশ্চিমেই থাকতে হয়। সে সময় ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে চেনা যায়। সুখে দুঃখে সমভাব, রোগযন্ত্রণা নিয়ে পরিহাস — বলতেন, "আমার শরীরে যে চিনির কল — একটু গরম না হ'লে উৎপাদন হবে কি করে?"

একে ভগ্ন স্বাস্থ্য তার ওপর ব্রজমোহনের ওপর সরকারের শনির দৃষ্টি, অসহযোগ আন্দোলনের বিশৃঙ্খলা — এ সমস্তই তিনি অসহায়ভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখে যেতে বাধ্য হলেন — কারণ বহুমূত্র রোগ তাঁকে জীর্ণ করে ফেলেছে। অবশেষে ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে ১৯২৩ সালের ৭ই নভেম্বর বেলা ২-৫৫ মিনিটে এই দেশবরেণ্য মহান জননেতার তিরোধান হয়। কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল, তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁর প্রাণপ্রিয় বরিশালে।

জীবনের কিছু বিশেষ ঘটনা

* অশ্বিনীকুমার গোপালকে রোজ দেখেন। সে মেথর — মদ খায়। কিন্তু সে অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। তার কাজে কোনদিন একচুল গাফিলতি দেখেননি অশ্বিনীকুমার। জল হোক, ঝড় হোক গোপাল প্রত্যহ খাটা পাইখানাগুলো হ'তে মল টিনে ভ'রে মাথায় ক'রে তার কর্তব্য ঘড়ির কাঁটা ধ'রে সম্পন্ন করে। মুগ্ধ অশ্বিনীকুমার। একদিন বিষ্ঠার টিন মাথায় নিয়ে চলার পথে গোপাল দেখে পথ আগলে বাবু। বাবু বললেন — "গোপাল তোর কর্তব্যনিষ্ঠায় আমি মুগ্ধ! তুই আমার কোলে আয়।" ঐ অবস্থায় কিভাবে গোপাল তাঁর কোলে আসবে? নাছোড়বান্দা অশ্বিনীকুমার ঐ অবস্থাতেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সম্মানিত করলেন।

* অসুস্থ অশ্বিনীকুমারকে দেখতে গেছেন তাঁরই এক ছাত্র, সঙ্গে এক অপরিচিত তরুণ। কুশল প্রশ্নের পর ঐ তরুণের পরিচয় নিতে সে নিজের গ্রামের নাম না ক'রে পাশের বড়গ্রামের নাম ক'রে বলল, "ঐ গ্রামের পাশের গ্রামে আমি বাস করি।" আবার জিজ্ঞাসা করায় সে গ্রামের নাম বলতেই অশ্বিনীকুমার সেই গ্রামের ৪/৫ জন প্রমুখ লোকের নাম করলেন — তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে।

* একবার ছাত্রদের সঙ্গে বেড়াতে বার হ'য়েছেন। রাস্তায় দেখেন এক দরিদ্র অসুস্থ মুসলমান পথে বসে রক্তবমি করছে। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের হাসপাতালে পাঠালেন। তারা চ'লে গেলে কি ভেবে নিজেই রোগীকে পীঠে নিয়ে হাসপাতালের দিকে হাঁটা দিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেরী হ'লে যদি রোগীর ক্ষতি হয়। পরে সেই রোগী সুস্থ হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়। সে বলে, "সেদিন বাবু যে উপকার ক'রেছেন আমার পীঠের চামড়া দিয়ে আপনার পায়ের জুতো তৈরী করে দিলেও তা শোধ হবে না।"

* ১৯০৮ সাল ১৩ই ডিসেম্বর সকাল ১০টা নাগাদ অশ্বিনীকুমারকে বন্দী করা হ'ল। মুহূর্তে তাঁর বাড়ী লোকে লোকারণ্য। সকলের নয়নে অশ্রুধারা। ঘোড়ার গাড়ীতে করে তাঁকে স্টীমার ঘাটায় নিয়ে গেল — পেছনে হাজার জনতা। স্টীমার তাঁকে নিয়ে চলে গেল। অনেকেই সারাদিন নদীর ধারেই বসে রইল — চোখে সব হারানোর শূন্য দৃষ্টি। সে দিন শহরে কারো বাড়ীতে উনান জ্বলল না। এক হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালা দুদিন পরে শোক সামলে বিছানা ছেড়ে উঠল। তার পর সে বাবুর মুক্তি কামনায় অশ্বিনীকুমারেরই পূজো দিল।

* ঐ মিঠাইওয়ালা কিছুদিন পরে দেশে গিয়ে শোনে তার বাড়ী হ'তে ৮০ মাইল দূরে লক্ষ্ণৌ জেলে অশ্বিনীকুমার বন্দী রয়েছেন। সে ঐ দীর্ঘপথ হেঁটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। পাছে টাকা না পেলে রক্ষীরা বাবুর সঙ্গে দেখা করতে না দেয় — তাই ধার ক'রে কিছু টাকাও সে সঙ্গে এনেছে।

* একদিন বেলা ১২টা নাগাদ অশ্বিনীকুমার বাড়ী ফিরে দেখেন এক অপরিচিত মুসলমান যুবক তাঁর ঘরে তক্তোপোযের পাশে রাখা বেঞ্চে ব'সে আছে। তিনি আর বিছানায় না গিয়ে বেঞ্চেই তার পাশে বসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কি ভাই অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি? বল তোমার কি দরকার?" সে বলল, "আর কোন দরকার নাই। যেজন্য এসেছিলাম, সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।" অশ্বিনী বাবু আবার প্রশ্ন করায় সে বলল, "বাবু আপনি সকলের মতো বক্তৃতায় বলেন, আমরা সকলে ভাই ভাই — কিন্তু সেটা কি সত্যিই আপনাদের মনের কথা? এটাই আমার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আপনার ব্যবহারে সে উত্তর আমি পেয়ে গেছি।"

* স্বদেশী আন্দোলন চলাকালেই একবার কুমিল্লা ও জামালপুরে নিরক্ষর মুসলমানেরা হিন্দুদের ওপর সহসা অমানুষিক অত্যাচার করে। সে সময় পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের সকলের মনেই ধারণা জন্মেছিল সর্বত্রই কোন না সময় মুসলমানের অত্যাচার হ'তে পারে।

বরিশালের হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। সহসা কাশীপুরের মুসলমান পাড়ার দিক হ'তে চিৎকার ওঠায় সকলে মনে করল মুসলমানরা আক্রমণ করতে আসছে। সতর্ক হিন্দুরা লাঠিসোঁটা হাতে দল বেঁধে ছুটল কাশীপুরের দিকে। খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বুলার সাহেব এসে কাশীপুরের পথ আটকে দাঁড়ালেন, "তোমরা ফিরে যাও — তোমাদের নিরাপত্তার ভার আমার।" কিন্তু কে কার কথা শোনে! হিন্দুরা স্পষ্টই বলল, "শাস্তি যা দেবার কাল দেবে — আজ তোমার কথা শুনছি না।" ইতিমধ্যে খবর পেয়ে অশ্বিনীকুমার এসে হাজির। তিনি গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে সকলকে ফিরে যেতে বললে, মন্ত্রের মতো কাজ হ'ল। তাঁর একটিমাত্র নির্দেশে উন্মত্ত জনতা শান্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে গেল।

* স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিহারী ধোপারা বলল, "যদি বিলাতি কাপড় না ধুতে চাইলে জমিদার আমাদের উচ্ছেদ করে, যদি শাস্তি দেয়, তাহলে কি হবে?" অশ্বিনীকুমার বললেন, "কোন ভয় নাই — সে ক্ষেত্রে আমি তোমাদের জায়গা দেব — অত্যাচার হ'লে আমি তোমাদের রক্ষা করব।" বাবুর কথা! ধোপারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরল। বিলাতি কাপড় বয়কট সর্বাত্মক হ'ল।

* অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ জেলে একটা সুন্দর নিমগাছের নীচে বসার ইচ্ছাপ্রকাশ ক'রে জেলার কে বললেন, "পাশে যে একটা পাইখানা রয়েছে।" পরদিন তিনি অবাক হয়ে দেখেন পাইখানাটি ভাঙ্গা হচ্ছে, আর নিম গাছের নীচে বেদী তৈরী হচ্ছে।

* তাঁর মুক্তির ঠিক আগে লক্ষ্ণৌ জেলের সুপার তাঁকে অনুরোধ করেন, "আপনার স্মৃতি হিসেবে এই জেলের মধ্যে আমরা কিছু রাখতে চাই। আপনি এখানে একটি গাছ লাগিয়ে যান এই অনুরোধ।" অশ্বিনীকুমার বললেন, "আমি অপুত্রক — আমার তো কোন চিহ্ন থাকবে না। তাই গাছ লাগাব না।" কিন্তু সাহেব নাছোড়বান্দা। সুতরাং অশ্বিনীকুমারকে গাছ লাগাতে হ'ল।

অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে বিপিন চন্দ্র পাল —

"অশ্বিনীকুমারের প্রতিভা ছিল না। হয়তো ছিল না। চুলচেরা হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ও ধরণের প্রতিভা খৃস্টেরও ছিল না, বুদ্ধেরও ছিল না। প্রতিভাবান পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বিদ্যাসাগরের নাম আজ নদীয়াবাসী ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতিভার পথ হেলায় পরিহার করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদগ্র উল্লাসে প্রেমের পথে নাচিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা আজও বাংলার ঘরে ঘরে হইতেছে। বরিশালের সৌভাগ্য, অশ্বিনীকুমারের প্রতিভা ছিল না, অথবা থাকিলেও তিনি তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন নাই। প্রতিভা হয়তো তাঁহার ও বরিশালের নিরক্ষর নর-নারীর মধ্যে এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করিত। প্রতিভা হয়তো বরিশালের নির্ধন ভিখারীর নিকট তাঁহার চিরমুক্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত। প্রতিভা হয়তো তাঁহাকে টানিয়া লইত নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে, প্রেম তাঁহাকে আনিয়াছিল একেবারে সকলের মধ্যে। বরিশালের সকলেরই নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারের কোল ঠিক ধরণীর মতোই সমান আদরে পাতা ছিল। তাইতো কেহই তাঁহার এতটুকু অন্যথা করিতে পারে নাই।"

এই পুস্তিকার সংকলনের কাজে 'বরিশাল সেবা সমিতি' বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি শাখার সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

সংকলক ঃ শ্রী সত্যব্রত সিংহ, সংগঠন সম্পাদক, বি.বি.পরিষদ
মুদ্রক ঃ ক্যালকাটা ব্লক এণ্ড প্রিন্ট, সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলি-৪
মূল্য ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।